উন্নয়নবিতর্ক ও রাষ্ট্রের দর্শনের কয়েক টুকরো

অচিন চক্রবর্তী

উপক্রমণিকা

উন্নয়নের সঙ্গে একধরনের শিল্পায়নভিত্তিক অর্থনৈতিক প্রগতির ধারণাকে যেভাবে মিলিয়ে ফেলা হচ্ছে বিভিন্ন মহলে, তাকে আর একটু উলটেপালটে দেখাটাই ছিল উদ্দেশ্য। দেখতে গিয়ে অর্থনীতির চৌহদ্দি ছাড়িয়ে দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে ঢুকে পড়লাম। না ঢুকে উপায় ছিল না। অর্থনীতির তথাকথিত নিয়ম, উন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা, অর্থনীতির ভালমন্দ থেকে মানুষের ভালমন্দ, ন্যায় - অন্যায়—এসব বুঝতে গেলে দর্শনের আঙিনায় এসে পড়তেই হবে।

শৃঙ্খলা থেকে ন্যায়বিচার

পশ্চিমী দুনিয়ার রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রসঙ্গে শৃঙ্খলার প্রয়োজনের কথা আজকাল আর কেউ ভাবে না। ভাবতে হয় না। রাষ্ট্র দিবারাত্র ভাঙশ উঁচিয়ে খাড়া আছে, তাই মানুষজন বাধ্য হয়ে নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলেছে— এই ধারণা পশ্চিমী দুনিয়া থেকে কবে বিদায় নিয়েছে। রাষ্ট্রের দর্শন বিষয়ে যাঁরা সন্দর্ভ লেখেন, স্বাভাবিকভাবেই শৃঙ্খলার প্রশ্নটা তাঁদের লেখাপত্তরে আর গুরুত্ব পায় না। অথচ দেখি মদীয় দেশে প্রায় প্রতিদিনই সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় কলামে হাহুতাশ করা হচ্ছে কেন সরকারবাহাদুর আরও কড়া হতে পারেন না। কই, সিঙ্গাপুরে তো কেউ ফ্যাক করে রাস্তায় থুথু ফেলে না। কড়া রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত দিতে হলে অনেকেই সিঙ্গাপুরের নাম করেন। অথচ রাস্তায় থুথু ফেলা না - ফেলার সঙ্গে কড়া রাষ্ট্রের যে একটা কার্য - কারণ সম্পর্ক থাকবেই এমন কোথাও কথা নেই। সিঙ্গাপুরে যেমন কেউ রাস্তায় থুথু ফেলে না, সিয়াটল কিম্বা বার্লিনেও বোধহয় ফেলে না, কাছাকাছি পুলিশ দাঁড়িয়ে না থাকলেও। ট্রাফিক পুলিশ আশেপাশের না থাকলেও লাল সিগন্যাল দেখে গাড়ি ছুটিয়ে দেয় না অধিকাংশ মানুষ।

অথচ হাব্‌সের সময়ে কিন্তু তা ছিল না। টমাস হব্‌সের লেভাইয়াথান পুস্তক প্রকাশিত হয় সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি। এটা আমাদের জানা যে হব্‌স সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন কড়া রাষ্ট্রের পক্ষে সওয়াল করে গেছেন। অবশ্য কড়া রাষ্ট্র কীভাবে তার ক্ষমতা অর্জন করবে তা ধরে রাখবে সে সম্পর্কে পরিষ্কার দিশা দিয়ে যাননি। যদি দিতেন, আজকের রাষ্ট্রনায়কদের খানিকটা সুবিধা হত। হব্‌সের সমসাময়িক ইংলন্ডে শৃঙ্খলারক্ষাই প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। পরবর্তীকালে মানুষজন যখন নিয়ম মেনে চলাকে অভ্যাসের পর্যায়ে নিয়ে গেছে তখন শৃঙ্খলা নিয়ে মাথাব্যাথাও কমে এল। তার জায়গায় এল ন্যায়বিচারের প্রশ্ন। দর্শনচর্চার বিগত প্রায় দেশ শতকের ইতিহাস যে প্রধানত ন্যায়ের দর্শনের ইতিহাস একথা বললে খুব ভুল হবে না। এই ইতিহাসের ধারায় গুরুত্বের বিচারে যে দু'জন দার্শনিকের নাম প্রথম সারিতে এসে পড়ে তাঁরা হলেন জন রল্‌স ও অমর্ত্য সেন। ন্যায়বিচার বা সামাজিক ন্যায়বিচার বলতে আমরা বুঝব সমাজ - অর্থনীতির প্রকৃতির কথা, যা ন্যায়ের বিচারে ভাল না মন্দ বলতে পারব। এই মূল্যায়নে দেখতে হবে সুযোগ বা সম্পদের বন্টনের দিকে, অধিকারের দিকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে অমর্ত্য সেন নতুন ধারণার অবতারণা করেন— সক্ষমতা বা কেপেবিলিটি। তাঁর মতে 'ক' সমাজ 'খ' সমাজ থেকে ন্যায়ের বিচার এগিয়ে আছে না পেছিয়ে আছে তা যাচাই করতে হবে সমাজের মানুষজনের সক্ষমতার নিরিখে। কোনও দেশের জাতীয় অর্থনীতির সমৃদ্ধির সঙ্গে প্রতিটি মানুষের ক্ষমতার বিকাশের একটা আপাত সম্পর্ক থাকলেও তা স্বতঃসিদ্ধ কিংবা অবধারিত বলে ধরে নেওয়া যায় না। অর্থনীতি নয় - শতাংশ হারে বেড়ে চললেই যে প্রতিটি মানুষের ম্যালেরিয়ামুক্ত পরিবেশে জীবনযাপনের ক্ষমতা বেড়ে যাবে এমন গ্যারান্টি নেই। তাই ন্যায়বিচারের প্রশ্নটা যে স্বতন্ত্রভাবে সবচেয়ে গুরুত্বের দাবিদার একথাটাই ঘুরে ফিরে অমর্ত্য সেনের লেখাপত্রে দেখা যায়। এই বিষয়ে পরে আবার ফিরে আসব। আপাতত শৃঙ্খলার বিষয়টায় ফিরে আসি।

হব্‌স থেকে যদি হিউম -এ আসি—প্রায় নব্বই বছরের ব্যবধানে দেখতে পারছি কড়া রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাটা আর অতিতীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে না। মোটামুটিভাবে স্বার্থচালিত মানবপ্রকৃতির পারস্পরিক বিনিময় বা মিথক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে স্বাভাবিকভাবেই নিয়মতান্ত্রিকতার উদ্ভব হতে পারে ডেভিড হিউম জোর দিচ্ছেন তার ওপর। যে -কোনও দর্শনের পেছনেই সমাজ নিয়ে একটা নির্দিষ্ট বিশ্লেষণের ছক থাকে। এই ছকের কেন্দ্রে থাকে মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে একটা পূর্বধারণা। আমি যদি ধরে নিই গড়পড়তা মানুষ নিজ নিজ স্বার্থ দ্বারা চালিত, তাহলে সামগ্রিকভাবে সমাজচিত্রটা কেমন হবে তা যুক্তি দিয়ে উপস্থাপনায় এক ধরনের তত্ত্ব পাওয়া গেল। আবার আমার ধারণায় যদি থাকে অধিকাংশ মানুষই পরার্থপর, তাহলে অন্যরকম তত্ত্বায়ন হবে। মজার ব্যাপার হব্‌স ও হিউম দু'জনেই মনে করেন, মানুষ মূলত আপন স্বার্থমত চলে। অথচ দুজনের দর্শন অনেকটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে, কারণ এই আপন স্বার্থচালিত মানুষের কর্মকাণ্ডের যোগফল যা দাঁড়াতে পারে তা নিয়ে দুজনের দু রকম মত । হব্‌স মনে করছেন আপন স্বার্থ সিদ্ধিতে মানুষজন কেবলই মারামারি কাড়াকাড়ি করে চলবে, যা সমাজপ্রগতির পক্ষে ভাল নয়। অতএব চাই একটা 'সামাজিক চুক্তি' যা সব্বাই মেনে চলবে। কিন্তু সবাই যে সে চুক্তি মানবেই তার নিশ্চয়তা কোথায়? নিজ নিজ স্বার্থই তাদের চালিত করবে 'সামাজিক চুক্তি'র দিকে। সবাই বুঝবে মারামারি কাড়াকাড়ি করে স্বার্থরক্ষা তো হবেই না, বরং সামাজিক চুক্তির ফলে ব্যক্তির ক্ষতির থেকে লাভই বেশি। নিয়মতান্ত্রিক সমাজ উঠে আসবে যে স্বতোৎসারিত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। এই 'স্পন্টেনাস অর্ডার' -এর ধারণা খুব জাঁকিয়ে বসে পশ্চিমী দর্শনে সেই থেকে। পরবর্তীকালে অনেকের লেখাপত্রেই এর উপস্থিতি দেখা যায়। এই দর্শন সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে সম্ভবত অর্থনীতিবিদদের, যার প্রভাবে পশ্চিমী অর্থনীতিবিদদের অধিকাংশই রাষ্ট্রের খবরদারি ভাল চোখে দেখেন না।

অর্থনীতি ও স্বতোবৃত্ত শৃঙ্খলা

স্পন্টেনাস অর্ডার -এর ধারণাটা মূল ধারার অর্থনীতিচর্চার এবং তত্ত্বায়নের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বরাবর।

অর্থনীতিবিদদের প্রবণতাই হল যে কোনও সামগ্রিক সামাজিক অবস্থাকে ব্যক্তিমানুষের কাজকর্ম, পছন্দ-অপছন্দ কিংবা সিদ্ধান্তের পরিণতি হিসাবে দেখা। ব্যক্তিমানুষ যে পূর্বনির্দিষ্ট সামাজিক পরিণতি লক্ষ্য নিয়েই সব করেছে তা নয়। স্বতোবৃত্ত শৃঙ্খলার ধারণার সবচেয়ে চমকপ্রদ দিক হল একটা। ব্যক্তিমানুষ যা করছে তা মূলত ব্যক্তিস্বার্থের কথা ভেবেই করছে, অথচ আমরা পেয়ে যাচ্ছি সুশৃঙ্খল বিনিময়ের নেটওয়ার্ক। অর্থনীতিবিদরা একেই বলে থাকেন 'আনইনটেন্ডেড কনসিকোয়েন্স'। আমি যে বাজারে গিয়ে উৎকৃষ্ট বেগুনটি ন্যূনতম দামে পেতে চাইছি, বেগুনওয়ালাও সর্বোচ্চ দামে নিকৃষ্ট বেগুনটি গছাতে চায়। আমরা নিজের স্বার্থমতো যা-ই চাই না কেন বিজারের 'অদৃশ্য হাত' তাদের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করে চলে— কোনও বাইরের প্রভাব ছাড়াই, আপাতদৃষ্টিতে। আমি যেমন বেগুন নিয়ে বাড়ি ফিরলাম— সর্বোৎকৃষ্ট হয়ত নয়, পচাও নয়, বেগুনওয়ালাও পয়সা গুঁজল ট্যাঁকে— যতটা চেয়েছি ততটা নয় হয়ত, তবে লাভ থাকল। বাজার কেমন চুপচাপ চাহিদা - যোগানের সামঞ্জস্যবিধান করে চলে— এই সরল অথচ আশ্চর্য 'আবিষ্কার' অর্থনীতিবিদদের বিমোহিত করে রাখে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। এই তথাকথিত স্বতোবৃত্ত শৃঙ্খলার কতটা যে স্বতোবৃত্ত এই প্রশ্নটা অনেক সময়েই চাপা পড়ে যায় আরও গভীর সমস্যাটা হল অনেক অর্থীনীতিবিদই এই শৃঙ্খলার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন ভালমন্দ, ন্যায় - অন্যায়ের প্রশ্নটা। সুশৃঙ্খল বিনিময়ের পরিবেশ মানেই তার পরিণতিটা সামাজিক ন্যায়বিচারের নিরিখে ন্যায্য হবে তার কোনও কারণ নেই। তাই পশ্চিমী দর্শনের ক্রমবিবর্তনে ন্যায়বিচারের প্রশ্নটা ক্রমে বেশি গুরুত্ব পেতে থাকে। এখানে ন্যায়বিচার বলতে আমরা বুঝব, আগেই উল্লেখ করেছি, বন্টনের ন্যায়নীতি বা ডিস্ট্রিবিউটিভ জাস্টিস। অনেক দার্শনিকই আবার শৃঙ্খলা বা কো-অরডিনেশনের প্রশ্ন থেকে ন্যায়বিচারের প্রশ্নটা আলাদা করে দেখতে চান না, বিশেষত যাঁদের দর্শনে মূলধারার অর্থনীতির মুক্তবাজারের ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন দার্শনিক রবার্ট নজিক কিংবা অর্থনীতিবিদ মিলটন ফ্রিডম্যান। এঁরা মনে করেন বাজারে বেচাকেনার অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে। এই অধিকার খর্ব করার চেষ্টাটাই অন্যায্য। অর্থাৎ ন্যায়ের প্রশ্ন এখানে থাকছে বটে, তবে সম্পদের ওপর ব্যক্তিগত অধিকার ও বিনিময়ের অধিকার সুরক্ষিত হলেই ন্যায় প্রতিষ্ঠা হল বলে ধরে নেওয়া হয়। স্বতন্ত্রভাবে সম্পদের বন্টন সংক্রান্ত প্রশ্নে ঢোকার প্রয়োজন রয়েছে বলে তাঁরা মনে করেন না।

শৃঙ্খলার সঙ্গে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির একটা যোগ রয়েছে। যেখানে শৃঙ্খলার অভাব—যাকে পণ্ডিতরা বলেন 'কোঅরডিনেশন ফেলিওর'—সমৃদ্ধিরও অভাব। পশ্চিমী দুনিয়ার ইতিহাস থেকে এটা বোঝা যায়। তবে তাদের সমৃদ্ধির সবটাই সামাজিক শৃঙ্খলার সঙ্গে পরিশ্রম ও বুদ্ধির যোগফল এই দাবি করতে গেলে ইতিহাসের বিকৃতি হবে। সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস বাদ দিলে পশ্চিমী দুনিয়ার সমৃদ্ধির ইতিহাসের সিংহভাগই আর পড়ে থাকে না। যাই হোক। শৃঙ্খলার অভাব থেকে যেখানে সমৃদ্ধির অভাব, ন্যায়বিচারের প্রশ্নটা সেখানে তেমন গুরুত্ব পায় না। ন্যায়ের প্রশ্নটা সেখানে থাকে বটে, তবে তা শৃঙ্খলাকে ঘিরে। অর্থাৎ বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলায় উত্তরণে ন্যায়ের দিকেও এগিয়ে যাওয়া হল বলে ধরে নেওয়া হয়।

হিউমও বন্টনের ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নে ঢুকতেই চাননি। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে—যে সময়ে হিউম তাঁর 'আ ট্রিটাইজ অফ হিউম্যান নেচার' লিখছেন—সেটাই ছিল স্বাভাবিক। তখন শৃঙ্খলার প্রশ্নটা গুরুত্বের ওপরে ছিল। কিছু পরে অ্যাডাম স্মিথ যখন জাতীয় বৈভব ও তার বিকাশ নিয়ে তাঁর বিখ্যাত পুস্তক লেখেন, 'স্বতোবৃত্ত শৃঙ্খলা' তার মূল দর্শন হয়ে দাঁড়ায়—স্মিত যাকে বলেছেন 'অদৃশ্য হাত'। যদিও স্মিথের লেখাপত্রে একটা বহুমুখীনতা লক্ষ করা যায়, অধিকাংশ অর্থনীতিবিদই সেসব জটিলতা সরিয়ে রেখে 'অদৃশ্য হাতের' সরল দর্শনে মজে থাকতে ভালবাসেন। অথচ হিউমের মতো স্মিথের ক্ষেত্রেও স্বাভাবিকভাবেই শৃঙ্খলার প্রশ্নটা তখনও প্রধান রয়েছে সেই অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে। উনবিংশ শতকে এসে দেখছি বন্টন ও ন্যায়বিচারের প্রশ্নটা ক্রমশ উঠে আসছে, যে পরম্পরায় বিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে এসে পাচ্ছি রল্‌স ও সেনকে। শৃঙ্খলা থেকে ন্যায়ের এই পরম্পরায় মার্কসকে আমি আলাদা, কিছুটা ব্যতিক্রমী বলে ধরে নেব। এ প্রসঙ্গে আবার পরে আসছি।

হাতের দৃশ্যমানতা

অদৃশ্য হাত একটি অতিকথা। নিজ স্বার্থ অনুসারী ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের সমষ্টি যে সামাজিক শৃঙ্খলার পরিণতি এর কোনও গ্যারান্টি নেই। ফলে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার দায় রাষ্ট্র ক্রমশই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে দেখা যায়। তবে উদ্দেশ্য যে সর্বদাই শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা তা নয়। ন্যায়বিচারের প্রশ্নটাকে দূরে ঠেলে রাখতে অনেক সময়ে রাষ্ট্রই শৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে থাকে। অথচ ন্যায়বিচারের প্রয়োজনে যেখানেই রাষ্ট্রের দৃশ্যমান হাতের প্রয়োজন পড়ে রাষ্ট্র হাত গুটিয়ে নেয়। যেমন অর্থনীতির ক্ষেত্রে। সব বাজারই ঠিক বেগুনের বাজারের মতো নয়। ফিনান্সপুঁজির বাজার একরকম তো স্বাস্থ্য পরিষেবার বাজার আর এক রকম। আলু, পটল, বেগুনের বাজারে যে তত্ত্ব খাটে ফিনান্সের বাজারে তা খাটে না। মূলত বিনিময়কারীদের মধ্যে তথ্যের অসমবন্টনই এইসব বাজারের প্রকৃতিকে অন্যরকম করেছে। সত্যম কিংবা লেম্যান ব্রাদার্স— যেদিকেই নজর দিই মূল সমস্যাটা হল এইসব কোম্পানির শেয়ার - মালিকদের যে তথ্য দেওয়া হচ্ছে তা থেকে এদের পরিচালকদের কাছে থাকা তথ্য অনেকটাই আলাদা হয়ে পড়ছে। স্বার্থচালিত মানবপ্রকৃতি থেকে এই পরিণতিতে এসে যাচ্ছি যুক্তির সরণি ধরে। অতএব উপায়? অদৃশ্য হাতের ওপর ভরসা না রেখে খবরদারি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে আঁটোসাটো করা। এখন অধিকাংশের মত এদিকেই। বর্তমান বিশ্বঅর্থনীতির টালমাটাল অবস্থার জন্য অনেকেই দায়ী করেছেন তথাকথিত স্পন্টেনাস অর্ডারের অন্ধবিশ্বাসকে। আগে আলোচনা করেছি, শৃঙ্খলা মানেই যে সামাজিক ন্যায়বিচারের নিরিখে তা ন্যায় এমনটা নয়। এখন দেখছি স্বতোবৃত্ত শৃঙ্খলার সম্ভাবনাটাই প্রায় ক্ষেত্রে নড়বড়ে।

মার্কস নন, হব্‌স কিংবা রুশো

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শাসক দলের পক্ষ থেকে জনসাধারণকে প্রায়ই মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে বিরোধী দলগুলির প্রধান উদ্দেশ্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। শৃঙ্খলার সঙ্গে সামাজিক ন্যায়বিচরের সরাসরি কোনও সম্পর্ক না থাকলেও সম্পর্কটা যুক্তি দিয়ে

তৈরি করা যায় উভয়ের মাঝখানে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রশ্নটা রেখে। যুক্তিটা হল, ন্যায়বিচার সম্ভব নয় বেহাল অর্থনীতিতে, আর বেহাল অর্থনীতিতে টেনে তুলতে প্রাথমিক প্রয়োজন শৃঙ্খলা। অবশ্য মানুষের ভাল থাকার সঙ্গে শৃঙ্খলার একটা সরাসরি যোগও স্থাপন করা যায়, তবে সেটা তর্কাতীত নয়। বস্তুতবামদলগুলি অতীতে ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে যে জাতীয় আন্দোলন করে এসেছে তা কিন্তু তথাকথিত শৃঙ্খলাকেই প্রধান করেছে। ইতিহাসের এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই যেখানে শৃঙ্খলার নামে ন্যায়বিচারের প্রশ্নটাকেই চাপা দেওয়া হয়েছে। উন্নয়নের প্রয়োজনে যখন শৃঙ্খলার বিষয়টা ফিরে ফিরে আসে আমাদের ফিরে তাকাতে হয় হব্‌স কিংবা রুশোর দিকে। শৃঙ্খলার প্রশ্নে এঁরা যতটা সাহায্যে আসেন, কার্ল মার্কস আসেন না। রুশোর 'সোশাল কনট্রাক্ট' -এ শৃঙ্খলার প্রয়োজনে এমন সব বিধান দেওয়া আছে যা টোটালিটেরিয়ান রাষ্ট্রের ছবি মনে পড়ায়। বস্তুত, স্ট্যালিনের ব্যাপার - স্যাপারের সমর্থনে রুশো থেকে চমৎকার সব উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। এমনকি ব্যক্তিমানুষকে 'স্বাধীন' করতে তার ওপর জোর খাটানোর প্রয়োজনের কথাও বলা আছে। সেই রসিকতাটা মনে পড়ে যাচ্ছে। একজন বয়স্কাউটে রোজ একটা 'ভাল কাজ' করতে হয়। দিনের শেষে দলপতি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজকের কাজটা কি খুব কঠিন ছিল'? ছেলেটির উত্তর, 'হ্যাঁ'। 'কেন? কী কাজ করেছ?' 'একজন অন্ধ মানুষকে আমি রাস্তা পার করিয়েছি', 'কাজটা শক্ত হল কেন?' 'রাস্তা পার হতে চায়নি সে।'

রুশো সার্বভৌম রাষ্ট্রের ক্ষমতার অবিভাজ্যতার কথা বলেছেন। এই ক্ষমতা যাতে টুকরো না হয়ে যায় তার জন্য সেনসারশিপের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন। বস্তুত রুশোর তত্ত্বায়নে ব্যক্তিস্বাধীনতা কিংবা ব্যক্তির অধিকার কোনও জায়গাই পায়নি। অথচ মার্কস যেহেতু সাংবাদিকতা ও পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, সংবাদপত্রে স্বাধীনতা নিয়ে জোরালো সওয়াল করে গেছেন। তাই পরবর্তীকালে স্ট্যালিনের কাজকর্মের সঙ্গে রুশোর যতটা নৈকট্য দেখি মার্কসের তা দেখি না। অথচ ইতিহাসের এমনই পরিহাস, মার্কস - এঙ্গেলস - লেনিন-স্ট্যালিন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির পরম্পরা তৈরি করে। মার্কস - এঙ্গেলস - লেনিন ও অন্যদিকে রুশো থেকে স্ট্যালিন এই দুই ধারার মধ্যে ভেদজ্ঞানের সময় এসেছে বোধহয়।

শেষকথা

উন্নয়ন হতে পারে বাহান্ন রকম রাস্তায়। তবে শৃঙ্খলা থেকে সমৃদ্ধিই যে ন্যায়বিচারের শেষ কথা নয় এটা অনুধাবন করা জরুরি। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য শৃঙ্খলার প্রয়োজন, আর অর্থনীতির বৃদ্ধি হলে তবেই না সামাজিক ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে সুষম বন্টনের প্রয়োজন— এ জাতীয় যুক্তি এখন অচল হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্র হব্‌সের আমলে যা করতে পারে বলে ভাবা যেত, এখন তা পারে না। পশ্চিমী দুনিয়ার সামাজিক দর্শনে বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলা, শৃঙ্খলা থেকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি হয়ে ন্যায়বিচারে পৌঁছতে যেমন কয়েক শতক লেগে যায়, উন্নয়নশীলবিশ্বে এই গোটা ইতিহাসের সমান্তরাল সামাজিক পর্যায়গুলো যেন একইসঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করতে থাকে। মানুষজন শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত হতে না হতেই রাষ্ট্রের ঘাড়ে অনেক কাজ এসে পড়ে। বন্টনের ন্যায়নীতিকে চেপেচুপে রেখে সমৃদ্ধির রথকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। শৃঙ্খলা, সমৃদ্ধি আর ন্যায়বিচার— এই ত্রিবিধ কর্তব্যসাধনে রাষ্ট্র দিশেহারা হয়ে পড়ে। এই বিভ্রান্তির প্রকাশ দেখা যায় এক বিশেষ ধরনের শিল্পায়ন প্রচেষ্টায় তনমনধন সমর্পনের বিচারবোধহীন আকুতিতে। উন্নয়ন যে প্রক্রিয়াই হোক না কেন মূল্যায়নটা হতেই হবে ন্যায়বিচারের নিরিখে— হতে পারে তা জন রল্‌স -এর 'বেসিক লিবার্টিজ' -এর সুষম বন্টন, অথবা অমর্ত্য সেনের ক্ষমতা। এঁদের তত্ত্বের ভালমন্দ কিংবা দুর্বলতার আলোচনা এখানে আনছি না— এই নিবন্ধের পরিসরে তা প্রাসঙ্গিকও নয়। মূল্যায়নের গ্রহণযোগ্য মাপকাঠিটা কী হবে তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু বিনিয়োগকারীদের জন্য জমি খুঁজতে গিয়ে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়নের বরাদ্দ কয়েকশো কোটি টাকা খরচ করা হয়ে উঠল না— এমন সম্ভাববনা হয়ত কমে আসবে যদি ন্যায়বিচারের দর্শনের টুকরোগুলি রাষ্ট্রের মগজে ঠুসে দেওয়া যায়।